

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৯

সূরা আলে ইমরান ১৩০-১৪৩ আয়াত

সূরা আল-ইমরান কুরআনের তৃতীয় সূরা এবং সর্বসম্মতভাবে মাদানি সূরা। সূরার আয়াত সংখ্যা ২০০। রুকু সংখ্যা ২০।

সূরার নামকরণঃ

এ সূরার ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াতদ্বয়ে আলে-ইমরানের কথা বলা হয়েছে। একেই আলামত হিসেবে এর নাম গণ্য করা হয়েছে। এ সূরার আরেক নাম আয-যাহরাহ বা আলোকচ্ছটা। [মুসলিমঃ ৮০৪]

এছাড়াও এ সূরাকে সূরা তাইবাহ, আল-কানুয, আল-আমান, আল-মুজাদালাহ, আল-ইস্তেগফার, আল-মানিয়াহ ইত্যাদি নাম দেয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল ও বিষয়বস্তুর অংশসমূহঃ

প্রথম ভাষণটি সূরার প্রথম থেকে শুরু হয়ে চতুর্থ রুকু'র প্রথম দু'আয়াত পর্যন্ত চলেছে এবং এটি সম্ভবত বদর যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়।

দ্বিতীয় ভাষণটিঃ (আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদের সারা দুনিয়াবাসীর ওপর প্রধান্য দিয়ে নিজের রিসালাতের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন) আয়াত থেকে শুরু হয়ে ষষ্ঠ রুকু'র শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে। ৯ হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনকালে এটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণটি সপ্তম রুকু'র শুরু থেকে নিয়ে দ্বাদশ রুকু'র শেষ অদি চলেছে। প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই এটি নাযিল হয়।

চতুর্থ ভাষণটি ত্রয়োদশ রুকু থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। ওহোদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়।

সম্বোধন ও আলোচ্য বিষয়াবলীঃ

এই বিভিন্ন ভাষণকে এক সাথে মিলিয়ে যে জিনিসটি একে একটি সুগঠিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে পরিণত করেছে সেটি হচ্ছে এর উদ্দেশ্য, মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য ও একমুখীনতা। সূরায় বিশেষ করে দু'টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দল হচ্ছে, আহলী কিতাব (ইহুদী ও খৃস্টান) এবং দ্বিতীয় দলটিতে রয়েছে এমন সব লোক যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল।

সূরা বাকারায় ইসলামের বাণী প্রচারের যে ধারা শুরু করা হয়েছিল প্রথম দলটির কাছে সেই একই ধারায় প্রচার আরো জোরালো করা হয়েছে। তাদের আকীদাগত ভ্রষ্টতা ও চারিত্রিক দুষ্কৃতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, এই রসূল এবং এই কুরআন এমন এক দীনের দিকে নিয়ে আসছে প্রথম থেকে সকল নবীই যার দাওয়াত নিয়ে আসছেন এবং আল্লাহর প্রকৃতি অনুযায়ী যা একমাত্র সত্য দীন। এই দীনের সোজা পথ ছেড়ে তোমরা যে পথ ধরেছো তা যেসব কিতাবকে তোমরা আসমানী কিতাব বলে স্বীকার করো তাদের

দৃষ্টিতেও সঠিক নয়। কাজেই যার সত্যতা তোমরা নিজেরাও অস্বীকার করতে পারো না তার সত্যতা স্বীকার করে নাও।

দ্বিতীয় দলটি এখন শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদা লাভ করার কারণে তাকে সত্যের পতাকাবাহী ও বিশ্বমানবতার সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব দান করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সূরা বাকারায় যে নির্দেশ শুরু হয়েছিল এখানে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধপতনের ভয়াবহ চিত্র দেখিয়ে তাকে তাদের পদাংক অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল। একটি সংস্কারবাদী দল হিসেবে সে কিতাবে কাজ করবে এবং যেসব আহলি কিতাব ও মুনাফিক মুসলমান আল্লাহর পথে নানা প্রকার বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করছে তাদের সাথে কি আচরণ করবে, তাও তাকে জানানো হয়েছে। ওহোদ যুদ্ধে তার মধ্যে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তা দূর করার জন্যও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এভাবে এ সূরাটি শুধুমাত্র নিজের অংশগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি এবং নিজের অংশগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করেনি বরং সূরা বাকারার সাথেও এর নিকট সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। এটি একেবারেই তার পরিশিষ্ট মনে হচ্ছে। সূরা বাকারার লাগোয়া আসনই তার স্বাভাবিক আসন বলে অনুভূত হচ্ছে।

সূরার ফযীলতঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ, তা পাঠকারীর জন্য কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দুটি আলোকচ্ছটায় সূরা আল-বাকারাহ ও সূরা আলে-ইমরান পড়; কেননা, এ দুটি সূরা কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যেন দুটি মেঘখণ্ড অথবা দুটি ছায়া অথবা দু’বাক পাখির মত। তারা এসে এ দু’সূরা পাঠকারীদের পক্ষ নেবে।’ [মুসলিমঃ ৮০৪]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, ‘কেয়ামতের দিন কুরআন আসবে যারা কুরআনের উপর আমল করেছে, তাদের পক্ষ হয়ে। তখন সূরা আল-বাকারাহ ও সূরা আলে-ইমরান থাকবে সবার অগ্রে।’ [মুসলিমঃ ৮০৫]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

১৩০. হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার ইবনে আকইয়াশের জাহেলী যুগের কিছু সুদের কারবার ছিল সে তা উসূল করা জন্য ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। তারপর যখন উহুদ যুদ্ধের দিন আসল, সে জিজ্ঞাসা করল, আমার চাচাত ভাই অমুক কোথায়? লোকেরা বলতঃ উহুদের প্রান্তরে, আবার জিজ্ঞাসা করতঃ অমুক কোথায়? তারা বলতঃ উহুদের প্রান্তরে, আবার জিজ্ঞাসা করলঃ অমুক কোথায়? লোকেরা বলতঃ সেও উহুদের প্রান্তরে। এতে সে তার যুদ্ধাস্ত্র পরে নিয়ে উহুদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে। মুসলিমগণ যখন তাকে দেখল তখন তারা বললঃ আমর! তুমি আমাদের থেকে দূরে থাক। কিন্তু সে জবাব দিল আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তারপর সে যুদ্ধ করে আহত হলো, তাকে তার পরিবারের কাছে আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হল।

সা'দ ইবনে মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে তার বোনকে বললেন তুমি তাকে জিজ্ঞাসা কর সে কি জাতিকে বাঁচানোর জন্য, নাকি তাদের ক্রোধে শরীক হওয়ার জন্য, নাকি আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করেছে? তখন আমার জবাবে বললঃ বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে। তারপর তিনি মারা গেলেন। ফলে জান্নাতে প্রবেশ করলেন, অথচ আল্লাহর জন্য এক ওয়াস্ত সালাত পড়ারও সুযোগ তার হয়নি। [আবু দাউদঃ ২৫৩৭, ইসাবাঃ ২/৫২৬] হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ আমি সর্বদা খুঁজে বেড়াতাম যে, আল্লাহ তা'আলা উহুদের ঘটনার মাঝখানে সুদের কথা কেন নিয়ে আসলেন, তারপর যখন এ ঘটনা পড়লাম তখন আমার কাছে এ আয়াতকে এখানে আনার যৌক্তিকতা স্পষ্ট হলো। [আল উজাবঃ ২/৭৫৩]

আরবী ভাষায় সুদের প্রতিশব্দ রিবা। বাংলাভাষায় 'সুদ' শব্দটি যেমন সুপরিচিত, তেমনি আরবী ভাষায়ও 'রিবা' শব্দের ব্যবহার বহুলপ্রচলিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওত লাভ এবং কুরআনে কারীম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবের জাহেলী যুগেও 'রিবা' শব্দটি প্রচলিত ছিল। শুধু তাই নয়, সে সময় রিবা অর্থাৎ সুদের লেনদেনও চালু ছিল। সূরা নিসার আয়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা আ.-এর যুগেও ইহুদীদের মধ্যে সুদের লেনদেনের রেওয়াজ ছিল এবং মূসা আ.-এর নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থ তাওরাতের 'রিবা' অর্থাৎ সুদের লেনদেনকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সুতরাং যে শব্দটি প্রাচীনকাল থেকে আরব ও তার আশপাশের এলাকায় পরিচিত ছিল এবং সে অনুযায়ী লেনদেনের রেওয়াজ ছিল, পবিত্র কুরআনে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার পাশাপাশি এ কথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূসা আ.-এর উম্মতের জন্যও রিবা তথা সুদ হারাম করা হয়েছিল; তাই তা এমন কোনো বিষয় নয়, যা কুরআন নাজিল হওয়ার সময় সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে বুঝা বা বুঝানো কঠিন ছিল। তারা সকলেই রিবার হাকীকত বুঝতেন। তাদের কাছে একথা স্পষ্ট ছিল- যে ঋণ ঋণদাতার জন্য কোনো ধরনের মুনাফা বয়ে আনে সেটাই রিবা।

এ কারণে অষ্টম হিজরীতে সূরা বাকারার রিবা সম্পর্কিত আয়াতগুলো যখন নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে রিবা'র নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক বিধান বুঝতে এবং মেনে নিতে কোনোরূপ বেগ পেতে হয়নি। মদ্যপানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা যেমন তাঁরা নির্দিধায় মেনে নিয়েছিলেন, তেমনি রিবা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা নাজিল হওয়ার পর তাও তাঁরা অকপটে মেনে নিয়ে সবধরনের সুদী লেনদেন ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, কুরআন নাজিল হওয়ার সময় আরবে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তা দূর করার জন্য এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। তার মানে এ নয় যে, চক্রবৃদ্ধি আকারে না হলে সুদ খাওয়া হালাল হয়ে যাবে। কারণ, অন্যান্য আয়াতে তো যে কোনো রকমের সুদ খাওয়াকে হারাম করা হয়েছে।

এখন আমরা দেখি, সুদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কারীমের কয়েকটি ভাষ্য-

যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই। আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। -সূরা বাকার (২) : ২৭৫

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। -
সূরা বাকারা (২) : ২৭৬

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।
যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা
তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা (কারও প্রতি) জুলুম করবে না এবং তোমাদের
প্রতিও জুলুম করা হবে না। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৮-২৭৯

সুদের নিষেধাঙ্গ সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকটি হাদীসসমূহ উল্লেখ করা
হলো :

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে-যে ব্যক্তি সুদ খায় এবং যে সুদ খাওয়ায়
উভয়কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৯৭; জামে
তিরমিযী, হাদীস ১২০৬; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৫১০৪

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে ৭টি গুনাহকে বড় গুনাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে
অন্যতম হল সুদ খাওয়া। -মুসনাদে বাযযার; আল মু'জামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ১০২; আলমুজামুল আওসাত,
তবারানী, হাদীস ৫৭০৯

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- যে সুদ খায়, যে সুদ খাওয়ায়, যে সাক্ষী থাকে এবং যে ব্যক্তি সুদের হিসাব-
নিকাশ বা সুদের চুক্তিপত্র ইত্যাদি লিখে দেয় সকলের প্রতি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত
করেছেন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৬০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৩৩; জামে তিরমিযী, হাদীস ১২০৬

এ ছাড়াও আরও অসংখ্য হাদীসে সুদ খাওয়া, সুদ দেওয়া এবং সুদের সাথে কোনোরূপ সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে
সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

১৩১. আর তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের সবার সাথে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে কথা
বলবেন যে, তার ও আল্লাহর মাঝে কোন অনুবাদকারী থাকবে না। তারপর প্রত্যেকে তার সামনে তাকিয়ে কিছুই
দেখতে পাবে না। অতঃপর সামনে তাকিয়ে দেখবে যে, জাহান্নাম তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসছে।
সুতরাং তোমাদের কেউ যেন একটি খেজুরের অংশ বিশেষ দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচায়।”
[বুখারী: ৬৫৩৯]

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

১৩২. আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার।

আলোচ্য আয়াতে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: (এক) আয়াতে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের সাথে রাসূলের
আনুগত্যেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা জানা কথা যে, রাসূলের আনুগত্য হুবহু আল্লাহর আনুগত্য বোঝায়।

তারপরও এখানে রাসূলের আনুগত্যকে পৃথক করে বর্ণনা করার তাৎপর্য স্বয়ং আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়। এতে আল্লাহর করুণালাভের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যকে যেমন অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্যকরা হয়েছে, তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকেও জরুরী ও অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু এ আয়াতেই নয়, বরং সমগ্র কুরআনে বার বার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং যেখানেই আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই রাসূলের আনুগত্যকেও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন পাকের এই উপর্যুপরি ও অব্যাহত বাণী ইসলাম ও ঈমানের এ মূলনীতির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, ঈমানের প্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ তথা অস্তিত্ব, প্রভুত্ব, নাম ও গুণ এবং ইবাদাত তথা দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য করা। (দুই) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মকবুল ও নিষ্ঠাবান পরহেযগার বান্দার গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য শুধু মৌখিক দাবীকে বলা হয় না, বরং গুণাবলী ও লক্ষণাদির দ্বারাই আনুগত্যকারীর পরিচয় হয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর বর্ণনা আসছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিচ্ছেন, কেননা তাদের একচ্ছত্র আনুগত্য করলে আল্লাহ তা'আলা রহম করবেন। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার রহমতের পরিবর্তে আমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: “ওহে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর। আর নিজেদের আমল নষ্ট কর না।” (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৩৩)

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

১৩৩. আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

এ আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের পর এটি দ্বিতীয় নির্দেশ। এখানে ক্ষমার অর্থ আল্লাহর কাছে সরাসরি ক্ষমা চাওয়া হতে পারে। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে এমন সব সংকর্ম এর উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয়। এটাই মত। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘কর্তব্য পালন’ ইবনে-আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, ‘ইসলাম’। আবুল আলিয়া বলেছেন ‘হিজরত’। আনাস ইবনে-মালেক বলেছেন ‘সালাতের প্রথম তাকবীর’। সাঈদ ইবনে-জুবায়ের বলেছেন ইবাদাত পালন। দাহহাক বলেন ‘জিহাদ’। আর ইকরিমা বলেছেন ‘তওবা’। এসব উক্তির সারকথা এই যে, ক্ষমা বলে এমন সংকর্ম বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।

এখানে দুটি বিষয় জানা আবশ্যিক। এক. শ্রেষ্ঠত্ব দু'প্রকারঃ

এক, ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা অর্জন করা মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির বাইরে। এগুলোকে অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। উদাহরণতঃ শ্বেতাঙ্গ হওয়া, সুশী হওয়া ইত্যাদি। দুই, ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা মানুষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে। এ গুলোকে ইচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা এবং বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। [যেমন, সূরা আন-নিসা ৩২] কারণ, এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্ স্বীয় হেকমত

অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বন্টন করেছেন। এতে কারও চেষ্টার কোন দখল নাই। সুতরাং যত চেষ্টা ও বাসনাই করা হোক না কেন এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে না। চেষ্টাকারীর মনে হিংসা ও শত্রুতার আগুন জ্বলা ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। তবে যে সব শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে মানুষের ইচ্ছা শক্তি কাজ করে থাকে সেগুলোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করার নির্দেশ বহু আয়াতে দেয়া হয়েছে। ঠিক এ আয়াতেও আল্লাহর ক্ষমার কারণ হয় এমন যাবতীয় কাজ করে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেননা এটা মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয়।

দুই. আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে ক্ষমাকে জান্নাতের পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবতঃ এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তবুও তার সমগ্র পুণ্যকর্ম জান্নাতের মূল্য হতে পারে না। জান্নাত লাভের পস্থা মাত্র একটি। তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ “সততা ও সত্য অবলম্বন কর, মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ কর। কারও কর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। শ্রোতারা বললোঃ আপনাকেও নয়কি- ইয়া রাসূলুল্লাহ। উত্তর হলোঃ আমার কর্ম আমাকেও জান্নাতে নেবে না। তবে আল্লাহ যদি স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন।” [বুখারীঃ ৫৩৪৯, মুসলিমঃ ২৮১৬] মোটকথা এই যে, আমাদের কর্ম জান্নাতের মূল্য নয়। তবে আল্লাহ তা'আলার রীতি এই যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ঐবান্দাকেই দান করেন, যে সৎকর্ম করে। বরং সৎকর্মের সামর্থ্য লাভ হওয়াই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষণ। অতএব সৎকর্ম সম্পাদনে ত্রুটি করা উচিত নয়।

আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমান। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের চাইতে বিস্তৃত কোন বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে জান্নাতের প্রস্থতাকে এ দু'টির সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাত খুবই বিস্তৃত। প্রশস্ততায় তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে নিজের মধ্যে ধরে নিতে পারে। এর প্রশস্ততাই যখন এমন, তখন দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, তা আল্লাহই ভাল জানেন। অবশ্য কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ জান্নাত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমান। কেননা তা আরশের নীচে গম্বুজের মত। গম্বুজের মত গোলাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হয়ে থাকে। এ বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস, তিনি বলেছেনঃ “তোমরা যখন আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে তখন ফেরদাউস চাইবে; কেননা তা সর্বোচ্চ জান্নাত, সবচেয়ে উত্তম ও মধ্যম স্থানে অবস্থিত জান্নাত, সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত। আর তার ছাদ হলো দয়াময় আল্লাহর আরশ। [বুখারীঃ ২৭৯০, ৭৪২৩]

তবে আয়াতের এ ব্যাখ্যা তখন হবে, যখন عرض শব্দের অর্থ طول তথা দৈর্ঘ্যের বিপরীতে নেয়া হয়। কিন্তু যদি এর অর্থ হয় মূল্য তবে আয়াতের অর্থ হবে যে, জান্নাত কোন সাধারণ বস্তু নয়- এর মূল্য সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল। সুতরাং এহেন মূল্যবান বস্তুর প্রতি ধাবিত হও। কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ আয়াতে উল্লেখিত عرض শব্দের অর্থ ঐ বস্তু যা বিক্রিত বস্তুর মোকাবেলায় মূল্য হিসেবে পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যদি জান্নাতের মূল্য ধরা হয়, তবে সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের সবকিছু হবে এর মূল্য। এতে করে জান্নাত যে অমূল্য বিষয় তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য।

জান্নাতের দ্বিতীয় বিশেষণে বলা হয়েছেঃ জান্নাত মুত্তাকীগণের জন্যে নির্মিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, জান্নাত সৃষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাত তৈরী হয়ে

আছে। আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাস। তাছাড়া কুরআন ও হাদীসে জান্নাতের যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে সেগুলোতে কোথাও কোথাও স্পষ্ট করে বলা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন। যেমন জান্নাতের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতের এক ইট রৌপ্যের ও এক ইট স্বর্ণের, তার নীচের আস্তর সুগন্ধি মিশকের, তার পাথরকুচিগুলো হীরে-মুতি-পান্নার সমষ্টি, মিশ্রণ হচ্ছে, ওয়ারস ও যা'ফরান। যে তাতে প্রবেশ করবে সে তাতে স্থায়ী হবে, মরবে না, নিয়ামত প্রাপ্ত হবে, হতভাগা হবে না, যৌবন কখনও ফুরিয়ে যাবে না, কাপড়ও কখনও ছিড়ে যাবে না।” [মুসনাদে আহমাদ ২/৩০৪, ৩০৫, সহীহ ইবন হিব্বান: ১৬/৩৯৬]

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন;

মোত্তাকী তারাই, যারা আল্লাহ তা'আলার পথে স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত। স্বচ্ছলতা হোক কিংবা অভাব-অনটন হোক, সর্বাবস্থায় তারা সাধ্যানুযায়ী ব্যয় কার্য অব্যাহত রাখে। বেশী হলে বেশী এবং কম হলে কমই ব্যয় করে। এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে নিজেকে মুক্ত মনে করবে না এবং সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে না। অপর দিকে আয়াতে এ নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব-অনটনেও সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখলে আল্লাহর পথে ব্যয় করার কল্যাণকর অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। সম্ভবতঃ এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন। স্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরও একটি রহস্য সম্ভবতঃ এই যে, এ দু'অবস্থায়ই মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য হলে আরাম-আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। অপরদিকে অভাব-অনটন থাকলে প্রায়ই সে চিন্তামগ্ন হয়ে আল্লাহর প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা আরাম-আয়েশেও আল্লাহকে ভুলে না কিংবা বিপদাপদেও আল্লাহর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঘায়েল বা পরাভূত করতে পারাটাই বীর হওয়ার লক্ষণ নয়, বীর হল ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে ক্রোধের সময় সম্বরণ করতে পেরেছে। [বুখারীঃ ৬১১৪, মুসলিমঃ ২৬০৯] অনুরূপভাবে এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেনঃ আমাকে এমন একটি কথা বলুন যা আমার কাজে আসবে, আর তা সংক্ষেপে বলুন যাতে আমি তা আয়ত্ত্ব করতে পারি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ রাগ করো না। সাহাবী বার বার একই প্রশ্ন করলেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই উত্তর দিলেন। [বুখারীঃ ৬১১৬; মুসনাদের আহমাদঃ ৫/৩৪] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে ক্ষমার বিনিময়ে কেবল সম্মানই বৃদ্ধি করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন। [তিরমিযীঃ ২৩২৫, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৪৩১] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন ক্রোধকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দমন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে ডেকে যে কোন হ্র পছন্দ করে নেয়ার অধিকার দিবেন।” [ইবন মাজাহঃ ৪১৮৬] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহর কাছে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্রোধ সম্বরণ করার চেয়ে বড় কোন সম্বরণ বেশী সওয়াবের নেই।” [ইবন মাজাহঃ ৪১৮৯]

সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ হলো এই যে, তাদের ক্রোধ বাইরে প্রকাশ পায় না এবং তাদের পক্ষ হতে লোকের প্রতি কোন অন্যায় হয় না। বরং তারা উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখে। আর তারা আল্লাহকে ভয় করতঃ পুণ্যের আশায় সমস্ত কাজ আল্লাহ তা'আলার উপর সমর্পণ করে। তারা মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। অত্যাচারীদের অত্যাচারের প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করে না। একেই বলে অনুগ্রহ এবং এরূপ অনুগ্রহশীল বান্দাকেই আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তিনটি কথার উপর আমি শপথ গ্রহণ করছিঃ (১) সাদকা দ্বারা মাল হ্রাস পায় না, (২) মানুষের অপরাধ ক্ষমা করার মাধ্যমে মানুষের সম্মান বেড়ে যায় এবং (৩) আল্লাহ তা'আলা বিনয় প্রকাশকারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। মুসতাদরিক-ই-হাকীমে হাদীস রয়েছে, যে ব্যক্তি চায় যে, তার ভিত্তি উঁচু হোক এবং মর্যাদা বেড়ে যাক তার জন্যে উচিত হবে যে, সে যেন অত্যাচারীদেরকে ক্ষমা করে দেয়, যারা দেয় না তাদেরকে প্রদান করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত করে। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এক আহবানকারী ডাক দিয়ে বলবেনঃ “হে জনগণকে ক্ষমাকারীগণ! তোমাদের প্রভুর নিকট এসো এবং স্বীয় প্রতিদান গ্রহণ কর। ক্ষমাকারী প্রত্যেক মুসলমানের জান্নাতে যাওয়ার অধিকার রয়েছে।

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ لَا يَكُنْ عَلَيْهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

১৩৫. আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে-বুঝে তারা তা পুনরায় করতে থাকে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন এক ব্যক্তি গোনাহ করার পর বললঃ হে আল্লাহ! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আবার আরেকটি গোনাহ করে আবারও বললঃ হে রব! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আবার আরেকটি গোনাহ করে আবারও বললঃ হে রব! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম, সে যাই করুক না কেন। [বুখারীঃ ৭৫০৭, মুসলিমঃ ২৭৫৮]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে আবু বকর হাদীস শুনিয়েছে। আর আবু বকর সত্য বলেছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, “কোন লোক যদি গুনাহ করে, তারপর পাক-পবিত্র হয় এবং সালাত আদায় করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন।” [তিরমিযী: ৪০৬; ইবন মাজাহঃ ১৩৯৫; আবু দাউদ ১৫২১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, “তোমরা দয়া কর, তোমাদেরকেও রহমত করা হবে, তোমরা ক্ষমা করে দাও আল্লাহও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, যারা কোন কথা না শোনার জন্য নিজেদেরকে

বন্ধ করে নিয়েছে তাদের জন্য ধ্বংস, যারা অন্যায় করার পর জেনে-বুঝে বারবার করে তাদের জন্যও ধ্বংস।”
[মুসনাদে আহমাদ: ২/১৬৫]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, শয়তান বলে, হে প্রভু! তোমার ইজ্জতের শপথ যতদিন তোমার বান্দাদের দেহে প্রাণ থাকবে ততদিন তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতেই থাকব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমার ইজ্জত ও মহত্বের শপথ, যতক্ষণ বান্দা আমার কাছে ক্ষমা চাইবে ততক্ষণ আমি তাকে ক্ষমা করবো। (আহমাদ হা: ১১২৪৪, হাসান)

‘তার ওপর জেনে-শুনে অটল থাকে না।’ মু‘মিনদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল তারা অপরাধ কাজ জানার পর সে অপরাধে অটল থাকে না। আল্লাহ তা‘আলা অপরাধ ক্ষমা করবেন, শর্ত হল জেনেশুনে বারবার করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমরা মানুষের ওপর দয়া কর, তোমাদেরকে দয়া করা হবে। মানুষকে ক্ষমা করে দাও, তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। যারা কথা বানিয়ে বলে তাদের জন্য দুর্ভোগ এবং দুর্ভোগ তাদের যারা জেনেশুনে পাপ কাজকে আঁকড়ে ধরে থাকে। (আদাবুল মুফরাদ হা: ৩৮০, সহীহ)

أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنَعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

১৩৬. তারাই, যাদের পুরস্কার হলো তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতইনা উত্তম!

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহু (জাতির) চরিত্র গত হয়েছে, কাজেই তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কি পরিণাম।

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল সাতশ’। তাদের মধ্য থেকে ৫০ জন তীরন্দাজের একটি দলকে রসূল (সাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর নেতৃত্বে (জাবালে রুমাত) ছোট পাহাড়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে নিযুক্ত করে বলেছিলেন, আমরা জিতে যাই বা হেরে যাই, কোন অবস্থাতেই তোমরা এখান থেকে নড়বে না। তোমাদের কাজ হবে, কোন অশবাবরোহী এদিকে এলে তাকে তীর ছুঁড়ে পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য করা। কিন্তু যখন মুসলিমরা বিজয় লাভ করে গনীমতের মাল জমা করছিলেন, তখন এই দলের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। কেউ কেউ বলতে লাগলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে নড়া হবে না। এখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, কাফেররা পশ্চাদপসরণ করেছে। অতএব আর এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। কাজেই তাঁরা সেখান থেকে চলে এসে মাল-পত্র জমা করার কাজে লেগে গেলেন। সেখানে নবী করীম (সাঃ)-এর নির্দেশের আনুগত্য করে কেবল দশজন সাহাবী রয়ে গেলেন। এদিকে ঘাঁটি শূন্য পেয়ে কাফেরা উপকৃত হল। তাদের অশবাবরোহী দল মুসলিমদের পিছন থেকে পাল্টা আক্রমণ করে বসল।

অতর্কিতে এই আক্রমণের কারণে মুসলিমদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং তাঁরা স্বাভাবিকভাবে বহু কষ্টের শিকারও হলেন। এই আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, তোমাদের সাথে যা কিছু হয়েছে, তা নতুন কিছু নয়; পূর্বেও এ রকম হয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত ধ্বংস ও বরবাদী তাদের ভাগ্যেই নেমে আসে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

১৩৮. এগুলো মানুষের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

১৩৯. তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও।

আলোচ্য আয়াতে মুসলিমদের হতাশ না হতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কতিপয় ক্রটি-বিচ্যুতির কারণে ওহুদের যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর কিছুক্ষণের জন্য মুসলিমরা পরাজয় বরণ করে সন্তরজন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হন। কিন্তু এ সবার পর আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়। এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি। (এক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি।

(দুই) খোদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলিমদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। (তিন) মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলিমদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের মৃতদেহছিল চোখের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিলো। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ক্রটি-বিচ্যুতির জন্যেও বেদনায় মুখড়ে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে দুটি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। (এক) অতীত ঘটনার জন্য দুঃখ ও বিষাদ। (দুই) আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতের জন্য মুসলিমগণ যেন দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ জাতি অঙ্কুরেই মনোবল হারিয়ে না ফেলে।

এ দুইটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্যে কুরআনের এ বাণীতে বলা হয় যে, ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আসতে দিয়ো না এবং অতীতের জন্যেও বিমর্ষ হয়ো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও আল্লাহর পথে জেহাদে অনড় থাক, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে। উদ্দেশ্য এই যে, অতীতে যে সব ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ভবিষ্যতে সংশোধনের

চিন্তা করা দরকার। ঈমান, বিশ্বাস ও রাসূলের আনুগত্য উজ্জল ভবিষ্যতের দিশারী। এগুলো হাতছাড়া হতে দিয়ো না। পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

১৪০. যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত তো ওদেরও লেগেছে। মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আমরা এ দিনগুলোর আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ মুমিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন। আর আল্লাহ যালেমদেরকে পছন্দ করেন না।

এখানেও অন্য এক ভঙ্গিমায় মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, উহুদ যুদ্ধে তোমাদের কিছু লোক আহত হয়েছে তো কি হয়েছে? তোমাদের বিরোধী দলও তো বদরের যুদ্ধে এবং উহুদ যুদ্ধের প্রথম দিকে এইভাবেই আহত হয়েছিল। আর মহান আল্লাহ তাঁর হিকমতের দাবীতে হার-জিতের পালা পরিবর্তন করতে থাকেন। কখনো বিজয়ীকে পরাজিত করেন, আবার কখনো পরাজিতকে করেন বিজয়ী।

وَلِيَمَّخَصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمَحِّقَ الْكَافِرِينَ

১৪১. আর যাতে আল্লাহ মুমিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমরা তাঁদের অবহেলার কারণে সাময়িকভাবে যে পরাজয়ের শিকার হন, তাতেও ভবিষ্যতের জন্য এমন কয়েকটি যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে, যা মহান আল্লাহ পরের আয়াতে বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ মহান আল্লাহ ঈমানদারদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করে দেখিয়ে দেন। (কারণ, ধৈর্য ও সুদৃঢ় থাকা ঈমানের দাবী।) যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে এবং মসীবতের সময় যাঁরা ধৈর্য ও সুদৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, অবশ্যই তাঁরা সকলেই মু'মিন। দ্বিতীয়তঃ কিছু লোককে শাহাদতের মর্যাদা দানে ধন্য করেন। তৃতীয়তঃ ঈমানদারদেরকে তাঁদের সমস্ত পাপ থেকে পবিত্র করেন। ثُمَّ حِصْنٌ শব্দ কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়ঃ যেমন, বেছে নেওয়া এবং পবিত্র, পরিশুদ্ধ বা বিশুদ্ধ করা। আর পবিত্র ও পরিশুদ্ধ বলতে, পাপ থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা। (ফাতহুল ক্বাদীর) আর চতুর্থতঃ কাফেরদের ধ্বংস সাধন। কারণ, সাময়িকভাবে জয়লাভে তাদের অবাধ্যতা ও দাস্তিকতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে এই জিনিসই তাদের ধ্বংস ও বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনো প্রকাশ করেননি?

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে যে, তিনি কাউকে পরীক্ষা না করে জান্নাতে দিবেন না। তিনি তাদেরকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে তারপর সে পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। পবিত্র কুরআনে এ কথাটি বারবার ঘোষিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ বলেন, “তোমরা

কি মনে কর যে, তোমরা জালাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সংগী-সাথী ঈমানদারগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৪] আরও বলেন, “তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ না প্রকাশ করেন তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ এবং কারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি?” [আত-তাওবাহ: ১৬] আরও এসেছে “মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি। এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে?” [সূরা আল-আনকাবুত: ২]

وَلَقَدْ كُنْتُمْ مَتَّئُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

১৪৩. মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার আগে তোমরা তো তা কামনা করতে, এখনতো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখলে।

মৃত্যু বা বিপদ কামনা করা জায়েয নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাত কামনা করো না; আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাও, তবে যদি তারপরও সাক্ষাত হয়ে যায় তা হলে ধৈর্য ধারণ কর এবং জেনে রাখ যে, জালাত তরবারীর ছায়ার নীচে’। [বুখারীঃ ২৯৬৬, মুসলিমঃ ১৭৪২]

ফুটনোট

- * সুদ খাওয়া, দেওয়া, সাক্ষ্য হওয়া কোনোভাবে সুদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না।
- * যে আয়াতে সুদের কথা বলা হয়েছে সেই একই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাকওয়া অর্জন করার মাঝে রয়েছে সফলতা। অর্থাৎ সুদ গ্রহণ করে ধনী হওয়াকে যে সফলতা মনে করা হয় সেটা প্রকৃত সফলতা নয়। প্রকৃত সফলতা হচ্ছে সুদের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া এবং তাকওয়া অর্জন করা।
- * সুদ গ্রহণ না করার পুরস্কার – জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নেওয়া।
- * সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা’আলা এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করা ওয়াজিব। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের পুরস্কার – আল্লাহর রহম পাওয়া
- * ক্ষমা ও জালাতের দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার
- * যারা দ্রুত রাগ দমন করতে পারে তাদের অনেক ফযীলত রয়েছে। তাই মুমিনের উচিত নিজেদের রাগ দমিয়ে রাখা
- * সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করা। আপনি কোনো বিপদে আছেন, কোনো পরীক্ষার মাঝ দিয়ে যাচ্ছে সাদকাহর পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ পথে ব্যয় বিপদ-মুসিবত দূর করে দেয়। অনুরূপভাবে সচ্ছল অবস্থায় বেশী বেশী আল্লাহ শুকরিয়া স্বরূপ দান করুন আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহ পথে ব্যয় সম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায়।
- * মানুষকে ক্ষমা করে দিন। ক্ষমা করা আল্লাহর গুণ। মানুষ যখন এই গুণ চর্চা করে আল্লাহ তখন সেটা পছন্দ করেন। এবং যারা মানুষদেরকে ক্ষমা করে দেয় আল্লাহও তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। মানুষের অপরাধ ক্ষমা করার মাধ্যমে মানুষের সম্মান বেড়ে যায়।

- * অপরাধ ঘটে গেলে দ্রুত তাওবাহ করা। ক্ষমা প্রার্থনা করা ও একই পাপ কাজ না করার অনেক ফযীলত রয়েছে।
- * মিথ্যুকদের পরিণতি সর্বদা খারাপ হয়, তারা সফলকাম হতে পারে না।
- * কুরআনের প্রত্যেক আয়াতে হিদায়াত ও উপদেশ রয়েছে।
- * ঈমানদারগণ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলকাম।
- * কোন অবস্থাতেই মৃত্যু কামনা করা যাবে না।
- * হতাশ হওয়া, চিন্তিত হওয়া কোনো বিজিত জাতির মধ্যে থাকতে পারে না। তাই মুমিনদের বিজয়ী হতে হলে- হতাশ হওয়া যাবে বা, চিন্তিত হওয়া যাবে না।